ফিরে দেখা

রঞ্জন প্রসাদ

শিকড় থেকে শিখর ছোঁয়া
যায় যেন সংগীতে
আনন্দ আর শান্তি শুধু
ঝরুক পৃথিবীতে...

'From the roots to the summit
May music find
The ultimate bliss
And peace for mankind...'

সংগীতের প্রতি এক গভীর প্রত্যয় থেকে এই পদ্যটি আমি রচনা করেছিলাম। আমাদের শাস্ত্রেও বলা আছে 'ন বিদ্যা সংগীতাৎপরা' (**Nothing beyond music– the ultimate knowledge**) মানুষের সভ্যতার পাশাপাশি পথ হেঁটেছে সংগীত। সেই সংগীতকে সেফ্রে **Entertainment Biz** (**business** এর অপভ্রংশ) বা আমোদ-বাণিজ্যের উপকরণ ভেবে নেওয়াটা ঠিক নয়। এই ব্যবসায় শরিক হইনি কখনও। মানুষের কাছে যাবার চেষ্টা করেছি, বুঝবার চেষ্টা করেছি তাদের গানের ভাষা। আমার এই পদাতিক জীবনের শুরু সেই ছাত্রাবস্থা থেকে। আমার অন্যতম শিক্ষাগুরু শ্রদ্ধেয় হেমাঙ্গ বিশ্বাস একে বলতেন বাহিরানা। কারণ কোনো ওস্তাদের কাছে তালিম নেবার ঘরানা আমার ছিল না। যেটুকু যা শিখেছি তা আকাশ-বাতাস-প্রকৃতি ও মানুষের সান্নিধ্যে। এখনও বারে বারে তারই কাছে ফিরে যাই। বিশ্বাস করতাম ধান থেকে যে গান ওঠে, তাতে থাকে প্রাণ। বিখ্যাত লোকগায়ক পিট্ সিগার যেটাকে বলতেন **'The music that rises from the soil and toil contains all the meat of life...'**

এই বিশ্বাসেই পথ হেঁটেছি। সঙ্গে ছিল চিরসঙ্গী গিটার এবং দোতারা যা কালী দাশগুপ্ত মশাই এবং পরিতোষ রায় আমাকে হাতে ধরে বাজাতে শিখিয়েছিলেন। এগুলো শুধু বাদ্যযন্ত্র নয়, মানুষের অন্তরের যন্তর, যাতে অনেক মন্তর-তন্তর থাকে, আয়ত্ব করতে পারলে আলাদিনের প্রদীপ হয়ে অন্ধকারেও পথ দেখায়। একাই পথ চলা যায়। কোনো 'হ্যান্ডস' লাগে না (যন্ত্রশিল্পীরাও তো শিল্পী, শুধু সহশিল্পী নন, তবে যাদের অনুষঙ্গ ছাড়া যখন বহুলাংশ কণ্ঠ শিল্পীরা নাচার, তাদের হ্যান্ডস কেন বলা হয় এ আমার বোধগম্য নয়)। আমার সাংগীতিক অভিযানের প্রায় পঁয়তাল্লিশ বছর পেরিয়েছি। ছয়ের দশকে কলেজ-ক্যাম্পাসে -ক্যান্টিনে টুকটাক গান গাওয়া ছাড়া উনসত্তর সালে চন্দননগরের মেরি পার্কে প্রথম বিশাল জনসভায় আমার হেমাঙ্গ বিশ্বাসের সঙ্গে মঞ্চে ওঠা এবং কয়েক হাজার দর্শকের সামনে একা গিটার হাতে গান গাওয়া। সেই সন্ধ্যায় জ্ঞানেশ মুখার্জি সদলে উপস্থিত ছিলেন ম্যাক্সিম গোর্কির 'মা' মঞ্চস্থ করার জন্য। এইসব মানুষদের দেখেছি এটাই পাওয়া। এছাড়া সে অর্থে শিল্পী হওয়া আমার হয়নি। তবে গান গাওয়া ছাড়িনি কখনও। এই রাজ্যের মূখ্য স্থাপত্যবিদ হিসেবে বহু মানুষের ঘর বাঁধার দায়িত্ব বর্তেছিল আমার উপর। তার পাশাপাশি মানুষের জন্য গানও বেঁধেছি সৃষ্টি সুখের উল্লাসে। তবে প্রচারের প্রয়োজন বোধ করিনি কখনও।

পৃথিবীটা নাকি ছোটো হতে হতে
স্যাটেলাইটে আর কেব্‌লের হাতে
ড্রইংরুমে রাখা বোকা বাক্সতে বন্দি
আহা— হা— হা...
(মহীনের ঘোড়াগুলি)

বাংলা গানের প্রবহমান ধারায় ব্যান্ডের উপস্থিতি এক নবীন সংযোজন। অনেকেই আমার কাছে এই ব্যান্ডের সাম্প্রতিক ধরন-এর আকস্মিক সাফল্য এবং এর ভবিষ্যৎ নিয়ে কৌতূহল প্রকাশ করেছেন। বলতে বাধা নেই যে আমি অনেক সুধীজনের কাছেই এই কৌতূহলের পিছনে আগ্রহের থেকে সন্দেহ, এবং আকর্ষণের থেকে বিকর্ষণের প্রবণতা প্রত্যক্ষ করেছি, এই নবীন আগুন্তুককে স্বাগত জানাতে তাদের কুণ্ঠা ও কার্পণ্য লক্ষ করেছি। এই ক্রমবর্ধমান উচ্ছাস, যা প্রধানত যুব-মানসের কথাই বলে, এবং তাদেরই কণ্ঠে ধ্বনিত হয় (এক কথায় **By the youth, of the youth & for the youth**)--- এটিকে শুধুই হুজুগ বা বেনোজল ধরে নিয়ে অপসংস্কৃতির ছাপ দিয়ে সরিয়ে রাখার প্রয়াস ফলপ্রসূ হবে বলে মনে হয় না। কারণ এই নবতম কুশীলবরা কিন্তু নিজেদের একটা জায়গা করে নিতে পেরেছে, এটা মানতেই হবে। এ মতটা চিরস্থায়ী হবে, তার বিচার হবে কালের নিরিখে— যা সব শিল্প-সংস্কৃতির ক্ষেত্রেই হয়ে থাকে। শুধু জানাই যে সমকালীন সংগীতের জগতে এই ব্যান্ডের আসা কোনো অতর্কিত নয়। এ আকাশ থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসেনি মোটেই। তার পটভূমিতে রয়েছে অনেক ঘটনাবলী। যুব সমাজের আশা-হতাশা, বিক্ষোভ এবং বিদ্রোহের ধারাবাহিকতা, এক কথায় একটা প্রসেস, যা এই ব্যান্ডগুলিকে প্রভাবিত করেছে। একটা হয়ে ওঠা বহুতলকে দেখে যেমন বোঝা উচিত যে তার একটা ভিত আছে, শূন্যে তা গজায় না, তেমনি আজকের ব্যান্ডেরও একটা ভিত আছে, যার জমি তৈরি হয়েছিল ষাট-সত্তরের দশক থেকেই। তবে সেই ধারায় এসে মিশেছিল বিশ্বের অনেক সংগীত ধারার উপাদান, তাই ব্যান্ড কোনো স্থানীয় সংবাদ নয়, বহুমাত্রিক চেতনার অবদানে সমৃদ্ধ হয়েছিল সেই প্রারম্ভিক প্রয়াস। তার উৎস বা শিকড়ের সন্ধান করতে গেলে সার্চলাইটের আলোকে পিছিয়ে নিয়ে যেতে হবে বিশ্বসংগীতের এক অসামান্য ফ্ল্যাশব্যাকে— সেই আদিম যুগ থেকে যার শুরু...

(১) **Wimmoweh, Wimmoweh**
Ho Ho Wimmoweh...
(দল বদ্ধ সিংহ শিকারের গান— আফ্রিকা)

(২)**'Day- o Day- o**
Daylight com'n we
want go home'
(ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জের কলা বোঝাই নৌকার মাল্লাদের দলবদ্ধ কোরাস)

(৩) তাই দিয়া নাই দিয়া না য়ে
দিয়া নারে নার তিরে হো হো হেইয়া...
(প্রাচীন পূব-বঙ্গের প্রচলিত সারিগানের দলবদ্ধ জিগির বা দোহার)

ভাষা পরিণত হবার আগে থেকেই আদিম মানুষ দলবদ্ধ নাচগানের ভিতর দিয়ে তাদের অস্তিত্ব বজায় রাখার তাগিদে বিচিত্র ধ্বনি সহকারে নিজেদের অভিব্যক্তি প্রকাশ করত এবং ভাব আদান-প্রদান করত। সেই **Hunter-gatherer** অবস্থা থেকেই; যখন দলবেঁধে শিকার ছিল তখন থেকেই তার দল বেঁধে শিকার এবং ফলমূল আহরণই তার বাঁচার একমাত্র উপায় ছিল তখন থেকেই তার দলবদ্ধ গানের শুরু যা ধীরে ধীরে তার জীবন ও জীবিকার সাথে বিবর্তিত হয়েছে। এটাই ব্যান্ড মিউজিকের প্রাচীনতম চেহারা বা ফর্ম, এবং এই দলবদ্ধ সংগীত মানুষের সভ্যতার পাশাপাশি পথ হেঁটেছে, কখনও তাকে ছেড়ে যায়নি। শুধু বিভিন্ন কর্মপ্রক্রিয়ায় সে রূপান্তরিত হয়েছে সুর থেকে সুরান্তরে— চাষের জমি থেকে দরিয়ায় নৌকায়, তাঁতশাল থেকে লোহাশালে, খামার থেকে খাদানে— সারা বিশ্ব জুড়েই তা ছিল এবং থাকবে।

আমার শৈশব কেটেছিল পুরুলিয়ায় অরণ্য-অধ্যুষিত অঞ্চলে। তখনও তা বিহারের অন্তর্ভুক্ত ছিল। বিজলি বাতিও আসেনি। সারাদিন বনে-বাদাড়ে দৌরাত্য করে সন্ধেবেলা হ্যারিকেন বা কেরোসিন কুপীর আলোয় শ্লেট-চকপেন্সিল হাতে পড়ার নামে ঘুমে ঢুলতাম, দেয়ালে কাঁপত সেই অপার্থিব আলো-অন্ধকারে আমার ছায়া। চাঁদ উঠত আমলকী গাছের মগডাল' পেরিয়ে, আর অদূরে সাঁওতাল পল্লী

থেকে ভেসে আসত ধামসা-মাদল-বাঁশি -কেন্দুরার অনুষঙ্গে দলবদ্ধ গানের সুর। সেই সুরের মাদকতা আমাকে সেই বয়সেই পাগল করে দিয়েছিল। আর আজও ছাড়ল না আমাকে। জ্ঞানত আমার দেখা ও শোনা সেই প্রথম আদিম ব্যান্ড মিউজিক যা জীবনের সঙ্গে জড়িত এবং জীবনের রসেই জারিত। এর শিকড় এতটাই গভীর যে কোনো সুশীল সমাজের ভ্রুকুটি বা অঙ্গুলিহেলনে তাকে উৎপাটিত করা সম্ভব নয়। কত রাজা এল গেল, কত রাজত্ব বদলালো, মারাংবুরু কিন্তু দিব্যি টিকে আছেন, আর রয়ে গেছে সেই আদিম ট্রাইবাল মিউজিক, তার শিকড়ে। এই শিকড় শব্দটাও লক্ষ্য করা খুব প্রয়োজন। এই প্রতিবেদনটি যার মূল উদ্দেশ্যই হল— মূল ও শিকড়ের সন্ধান, সেখানে শিকড়ের কথাটা বার বার ঘুরে ফিরে আসবে। কারণ সেখানে পৌঁছতে না পারলে কোনো শিল্প-সংস্কৃতিই কালজয়ী হয় না, কোথাও হয়নি কখনও। উল্কার মতো উদয় হয়ে অচিরেই বিদায় নিয়েছে, জীবনের অঙ্গ হয়ে উঠতে পারেনি। চিরস্থায়ী হয়নি। বাংলা ব্যান্ডের অনুজপ্রতিম কুশীলবদেরও এই সত্যটি বুঝতে হবে। কোনো সাময়িক সাফল্য বা হুজুগ নয়, যদি নিজের শিকড় চিনে নিয়ে মাটিতে এবং জনমানসে স্থিত হওয়া যায়, তবে কোনো সমালোচকের সাধ্য নেই একে তুলে বঙ্গোপসাগরে ফেলে দেবার।

শান্তিপুর ডুবু ডবু
নদে' ভেসে যায়...

বিশ্বের অঙ্গন ছাড়িয়ে যদি এই বাংলার মাটিতে আসি, তবে এখানে ব্যান্ডের আর্বিভাব একজন যুগন্ধর মহাপুরুষের হাত ধরে, তাঁর নাম শ্রী চৈতন্যদেব। শ্রীখোল-করতাল-খঞ্জনি-বাঁশির অনুষঙ্গে তিনি একদিন সহস্র বাঙালিকে... এক বিশাল আন্দোলনে সামিল করেছিলেন, যার প্রধান মাধ্যম ছিল দলবদ্ধ নৃত্যগীত বা সংকীর্তন। সেই উন্মাদনা ছড়িয়ে পড়েছিল নদীয়া থেকে সারা বাংলায় এবং বাংলার বাইরেও। তার রেশ আমাদের রক্তে ঢুকে আছে, যা আজও আমাদের প্রভাবিত করে— সমকালীন গানেও যার অনেক উদাহরণ আছে। কবীর সুমনের (তখনও চট্টোপাধ্যায়) বিখ্যাত গান 'তোমাকে চাই' এর **Refrain** এর পিছনে **Descending note**-এ চিরচেনা সুরের হরিবোল যেন উঁকি দিয়ে যায়— এক যথার্থ আত্মীকরণে। অতীতের সাংগীতিক উপাদান থেকে এই সচেতন আত্মীকরণের অধিকার পরবর্তী কালের সংগীতস্রষ্টাদের আছে— যা কোনোমতেই বোধহীন আত্মসাতের পর্যায়ে পড়ে না। এই বিষয়ে আমাদের শ্রেষ্ঠ পথপ্রদর্শক রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং। প্রসঙ্গত আমাদের বাউলের আখড়াগুলোর মধ্যেও ব্যান্ডের চরিত্র বা ক্যারেকটার মিশে আছে। বাউলগানে এক জীবনদর্শন থাকে, সঠিক অর্থে ব্যান্ডেরও তাই— যেখানে তার সমমনস্ক সদস্যদের সংগীত চর্চার সঙ্গে জীবনচর্চারও সাযুজ্য থাকে, গানে গানে যা উচ্চারিত হয়। ব্যান্ডের সঙ্গে কয়্যার-এর এই পার্থক্য আছে। দুটোই দলবদ্ধ গান, কিন্তু চরিত্রে ও বক্তব্যে ভিন্ন জাতের। ব্যান্ডে কেউ কারো সহশিল্পী নন, সবাই একসঙ্গে গান ও বাজনার মধ্যে নিজেদের মননেরই প্রতিফলন রেখে যান। ভাড়াটে সৈনিক দিয়ে যেমন ক্রুসেড হয় না, ভাড়াটে শিল্পী নিয়েও তেমন ব্যান্ড হয় না। এই একটি জায়গায় লালন-লেনন মিশে একাকার হয়ে যান।

Let's rock, everybody let's rock
Everybody in the whole cell block
Was a dancin' to the jailhouse rock...
(এলভিস প্রেসলি)

ষাটের দশকের গোড়ার দিকে যখন ইস্কুলের গণ্ডী পার হয়ে সদ্য কলেজে ঢুকতে চলেছি তখন একটি রবিবারে মর্নিংশো (তখন নিয়মিত হত) দেখতে গিয়ে এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হল। সিনেমাটিতে সারা পর্দা জুড়ে একজন পুরুষ যুবক একটি মাত্র তারের যন্ত্রের অনুষঙ্গে গান গাইছেন, যে তরঙ্গ তার সারা শরীর বেয়ে ছড়িয়ে পড়ছে সারা প্রেক্ষাগৃহে। সে এক ভিন্ন স্বাদের উন্মাদনা যা দর্শকদেরও সংক্রমিত করছে এবং তারাও আকৃষ্ট হচ্ছেন সেই সুর এবং ছন্দের দোলায়। এলভিস প্রেসলিকে সিনেমায় সেই আমার প্রথম দেখা (যতদূর মনে পড়ছে সিনেমাটির নাম ছিল লাভিং ইউ)। সাদা-কালোর সুরের মিশেলে তৈরি এই স্টাইলটি রক-এন-রোল নামে প্রভূত জনপ্রিয়তা লাভ করল। এই প্রতিবেদনে এই প্রসঙ্গটি এই কারণেই গুরুত্বপূর্ণ যে সেই তারে যন্ত্রটি অর্থাৎ গিটার যা বাজিয়ে তিনি গান গাইছিলেন। অনুষঙ্গ হিসেবে এই যন্ত্রটি আজ ব্যান্ডের হাতে হাতে ঝলসাচ্ছে, যা ঘরে-বাইরে, প্রেক্ষাগৃহ থেকে প্রান্তরে সমান শক্তিশালী, যাতে সুর এবং ছন্দ বা তাল দুটোই আছে যা একবার শিখে ফেলতে পারলে কিছু ছাড়াই গান গাওয়া যায়। সেই সময় থেকেই আমাদের নজর কেড়ে নিল সেই স্প্যানিশ গিটার(হাওয়াইয়ান নয়) যার চর্চা এখানে তখনও বিরল, গানের অনুষঙ্গ হিসেবে সেই গিটারের ক্ষমতা আমাদের প্রজন্মকে আকৃষ্ট করল। অচিরেই ভিয়েতনাম যুদ্ধে একটি শক্তিশালী মারণাস্ত্র সজ্জিত আগ্রাসী দেশের সরকারকে চ্যালেঞ্জ করলেন একদল শিল্পী কবি গায়ক, স্রেফ এই গিটারকে হাতিয়ার করে। এবং তারা জিতলেন, বন্ধ হল সভ্যতার আর একটি কলঙ্কজনক অধ্যায়। সারা বিশ্বে ছড়িয়ে গেল সেই গানের কথা— **How may roads must a man walk down/ Before you call him a man (Blowing in the wind**– বব ডিলান)

সেই থেকেই গিটার হাতে পদাতিক হবার বাসনা আমার মনে বাসা বাঁধল। সার্চলাইটের আলো কিন্তু তখন মার্কিন মুলুক থেকে সরে গিয়ে আটলান্টিক পেরিয়ে ফোকাশ সরছে ইংল্যান্ডের লিভারপুলে।

It's been a hard days night
And I've been working like a dog...
(The Beatles)

এই ষাটের দশকেই লিভারপুলের চারটি তরুণ যুবক এক নতুন জোয়ার আনলেন। সাবেকী ইংরেজ সমাজের প্রথাগত রক্ষণশীল ও কলোনিয়াল ইমেজ ভেঙে দিয়ে চোখের উপর চুল ঝুলিয়ে সারা পৃথিবীর দিকে হাত বাড়িয়ে গেয়ে উঠলেন **'I wanaa hold your hand.'** এবং প্রত্যুত্তরে সারা পৃথিবীই তাদের হাত বাড়িয়ে স্বাগত জানাল। বস্তুত ভয়ানক বিশ্বযুদ্ধের পর সারা পৃথিবীই তখন যুদ্ধের পরিবর্তে শান্তি, গ্রেনেডের পরিবর্তে গিটার, হিংসার পরিবর্তে ভালোবাসা চাইছে। এই চারটি যুবকের নাম, জন লেনন, পলম্যাকারনি, জর্জ হ্যারিসন এবং রিংগো স্টার, এক কথায়া দ্য বিট্‌লস। এদের প্রভাবে সারা বিশ্বেই এই রকম দল তৈরি হল। ব্যবহারে এরা তিনটি ভাগে বিভক্ত করে নিয়েছিলেন গিটার, বেস (**Base**) রিদম, (**Rhythm**) আর লিড (**Lead**) সঙ্গে ড্রামস। সবাই বাজায় সবাই গায়, কেউ কারো সহশিল্পী নয়, একদম ব্যান্ডের চরিত্র একটু আগেই যা লিখেছি। এদের খাঁচে প্রচুর দল, যারা বিটগ্রুপ নামে পরিচিত হলেন। এখানেও শহরগুলোতে একরকম গ্রুপ বা ব্যান্ড তৈরি হল। যাদের কথা এই মুহূর্তে মনে

পড়ছে তারা কলকাতার গ্রেট বেয়ার, ব্ল্যাক ক্যাকটাস, ফ্লিন্টস্টোনস, হেল-ফায়ার, দ্য কিউ, মহামায়া, হাইলুন, সুগারফুট, দ্য হান্টার্স, শিভা, হাই, দ্য আর্জ ; মুম্বইতে (তখন বোম্বে) অ্যাটমিক ফরেস্ট, স্যাভেজ এনকাউন্টার, গ্রেট গারুডা, চেন্নাইতে (তখন মাদ্রাজ) দ্য মিথ, ব্যাঙ্গালোরে হিউম্যান বন্ডেজ, কোণারক, শিলং-এ দ্য ভ্যানগার্ডস, আমেদাবাদে দ্য ট্রায়োড, বাংলাদেশে (তখন সদ্যজাত) দ্য আগলি ফেসের এবং আরো অসংখ্য। এখানে বলে রাখি কলকাতার 'দ্য আর্জ' বলে যে দলটির কথা উল্লেখিত হল তার লিড গিটারিস্ট ছিল গৌতম চট্টোপাধ্যায়। এই সময় থেকেই ও একটা সম্পূর্ণ বাংলা ব্যান্ডের কথা ভাবছিল, যা পরে 'মহীনের ঘোড়াগুলি'র রূপ নিয়ে বাস্তবায়িত হয়। দু'বাংলা মিলিয়ে প্রথম বাংলা ব্যান্ড হিসেবে, যা শেষ হয়েও শেষ হয়নি, আমার ধারণা রূপমের ফসিল্‌স পর্যন্ত তার প্রভাব রয়েছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। তবে ওই ধরনের বিটগ্রুপগুলো খুব বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। দ্য বিটলসের ধরনে গড়ে ওঠা হুবহু তার কপি বা এদেশি সংস্করণ এই দলগুলির সঙ্গে এদেশের মাটির কোনো সম্পর্ক ছিল না। তার কোনো শিকড় খুঁজে পায়নি। হয়তো চেষ্টাও করেনি। এদের পুরো ব্যাপারটাই ছিল শহরকেন্দ্রিক, এবং একটি বিশেষ অর্থনৈতিক শ্রেণিভুক্ত, যা শহরে শুরু হয়ে শহরেই শেষ হয়ে যায়। নাগরিক টবে লালিত এই বিদেশি ফুল টবেই ঝরে গেল, কেবল হাওয়ার ভেসে রইল তার কিছু গন্ধ বা পরাগরেণু, যা পরবর্তীকালে বাংলা ব্যান্ডের পুনরুজ্জীবনে নিশ্চিতভাবেই পরোক্ষে সহায়তা করেছে।

আমরা প্রাণের রসদের জন্য বাইরে তাকিয়েছিলাম। কারণ সদ্য ভিয়েতনাম যুদ্ধে শিল্পীদের বিজয় আমাদের অনুপ্রাণিত করেছিল। এই উদ্দীপনা সারা বিশ্বের ছাত্র সমাজেই ঘটেছিল। এই উদ্দীপনা সারা বিশ্বের ছাত্রসমাজেই ঘটেছিল। আমরা তার শরিক হয়ে বাংলা গানেরও একটা নতুন রূপ দিতে চেয়েছিলাম। যৌবনের স্বপ্ন-মেধা-প্রতিভা-বিদ্রোহ-বিপ্লবের এক অদ্ভুত রসায়ন ছিল আমাদের এই অ্যাডভেঞ্চার-এর প্রেরণা-এর পেছনে কোনো বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য ছিলই না। প্রচার-প্রসার প্রোপাগাণ্ডার প্রস্তুতিও ছিল না। তাই একে একে হয়ে ওঠা এই বাংলা ব্যান্ডের প্রয়াসগুলো বলবার মতো সাফল্য বা স্বীকৃতি পায়নি। বরং দর্শক-শ্রোতাদের এবং তৎকালীন রক্ষণশীল সমাজের থেকে অবজ্ঞা, ঔদাসীন্য এবং অনাদরই পেয়েছে। মহীনের ঘোড়াগুলির পরেও নগর ফিলোমেল, বাইসাইকেল, এক্কা, স্পন্দন এই ব্যান্ডগুলো তৈরি হয়েছে, কিন্তু দর্শক-শ্রোতাদের অনাগ্রহে তারা সরে গিয়েছেন। অথচ উত্তরজীবনে তাদের অনেকেই অত্যন্ত যশস্বী হয়েছেন। তাহলে কি সময়ের আগে এগিয়ে চিন্তা করার মাশুল দিতে হয়েছিল? তাই সত্তরের দশকে যা রূপায়িত হয়েছিল, অনেক বছর পরে নব্বইয়ের দশকে তা যখন বাঙালি শ্রোতা দর্শকেরা নতুন বাংলা গানকে স্বাগত জানালেন, তখন সব অপ্রাপ্তি পার হয়ে একটা পরিতৃপ্তি দুঃখের পাশাপাশি একটা আনন্দ তো হলই, যাক আমাদের সব প্রচেষ্টা অন্তত জলে যায়নি। জীবনের ধন কিছুই যায় না ফেলা।

আশায় আশায় বসে আছি
ওরে আমার মন
কখন তোমার আসবে টেলিফোন...
(গৌতম চট্টোপাধ্যায়)

ঘুরন্ত জীপের চাকায়
হাইওয়ে যেন গান গায়
বহুদূরে দেখা দেখা যায়
আর্মি ট্রাকের কনভয়
(গ্যাংটকের পথে: লেখক)

ষাট এবং সত্তরের দশকে একদল তরুণ ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বর ছাড়িয়ে পাঠক্রমের থেকে সময় বের করে এক নতুন কথা নতুন গান গাওয়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন— এই প্রতিবেদকও তার শরিক ছিলেন। রাস্তা অনুকূল ছিল না, পারিবারিক সহায়তা শূন্য, সমর্থক মাত্র গুটি কয়েক। এই মাত্র সম্বল করে অন্তত চল্লিশ বছর এগিয়ে থেকে বাংলা গানে একটা উত্তরাধুনিক চেহারা (আধুনিক গান বলতে যা বোঝায় তার সবটাই তখন আধুনিক ছিল কি?) দেবার কাজটা সহজসাধ্য ছিল না মোটেই। এবং এই নবীন সাংস্কৃতিক আন্দোলনটি (পড়ুন বিদ্রোহটি) উঠে এসে ছিল ক্যাম্পাসগুলো থেকে, কোনো রূপোলি পর্দা বা মঞ্চ থেকে নয়। এক অদ্ভুত রোমান্টিকতার যাদুমন্ত্রে তৈরি হয়ে যেত গান, নাটক, ছবি, কবিতা এবং কী আশ্চর্য, তারা রসোত্তীর্ণও হত, যাকে ঘরানা না বলে বাহিরানা বলাই ভালো। বাংলা গানের বক্তব্যে তখনও জলসাঘর, ঝাড়বাতি, নাচমহল, বুলবুলি, বাঈজির ক্লিশে উপস্থিতি, (আইপিটিএ যুগ পার হওয়া সত্ত্বেও) তা আমাদের ডবল বিতৃষ্ণা তথা বিদ্রোহে বাধ্য করেছিল কারণ এই ক্ষয়িষ্ণু বাবু কালচারের সঙ্গে আমাদের গতিময় পারিপার্শ্বিকের কোনো মিল ছিল না। সংযোজন সময় ক্রমশ হয়ে উঠছিল উত্তাল, বাতাসে ছিল বারুদের গন্ধ। তাই

গান ভালোবেসে গান
(চন্দ্রবিন্দু)

তোমার দেখা নাইরে
তোমার দেখা নাই
(ভূমি)

মা দেখা দে
নয় টাকা দে
(কালপুরুষ)

এখন সময় বদলেছে। শ্রোতা-দর্শকরাও নতুন বাংলা গান চাইছেন। কর্মসূত্রে আমি পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলো এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলে গিয়ে দেখেছি মানুষ এখন বাংলা ব্যান্ডের সম্বন্ধে খবর রাখেন। এই চাহিদা, এই প্রত্যাশা যদি ব্যান্ডের দলগুলো পূরণ করতে পারেন, তাহলে আর প্রত্যাখ্যাত হবার প্রশ্ন নেই। তবে শুধু বিদেশী উপাদান নয়, একদম দেশী উপাদান থেকে আসুক গানের রসদ। গিটার-সিন্থেসাইজার ড্রামের সঙ্গে মিশুক বাঁশি-খমক-দোতারা, ক্যালিপসো হাত রাখুক বিহু ভাটিয়ালিতে, এবং উন্নত বিশ্বমানের রুচি তৈরি হবে বাংলা গানেও। এখনও যারা বলে চলেছেন। **'These Bangla Bands should be banned'** তাদেরও গান ভালো লাগানো একটা দায়িত্ব। বাংলা ব্যান্ডও এখন বাঙালি সমাজেররই একটা অংশ, তাই তার মেনস্ট্রিম সংস্কৃতিতে জায়গা করে নেওয়াটাই একটা বড়ো চ্যালেঞ্জ। এরজন্যে প্রস্তুতি ও পরিশ্রম দুটোই প্রয়োজন। প্রতিভা আর মেধা যদি এর সঙ্গে মেশে তবে আরো ভালো। সংগীত একটি শক্তিশালী মাধ্যম। ব্যান্ডও সংগীতেরই একটি ধারামাত্র। তাই ফাঁকিবাজি থাকলে তা ধরা পড়তে বাধ্য। তখন আগ্রহী শ্রোতারা আবার বেঁকে বসবেন, পুরো

মুভমেন্টটাই পিছিয়ে যাবে। মেধার সঙ্গে কোনো আপোষ নয়। 'উচ্চমাধ্যমিক ছারখার/তাই ব্যান্ড করা খুব দরকার'— এই প্রবণতা ভালো নয়। 'হাতে গিটার মাথায় ঝাঁকড়া চুল, সবার কানে একটা করে দুল' এভাবে শুধু ভঙ্গি দিয়ে চোখ ভোলানোর চেষ্টা করলেও মানুষ বিরক্ত হবেন। আর একটি অশনি সংকেতের কথাও এই প্রসঙ্গে বলার দরকার আছে। প্রচুর চ্যানেলে অহোরাত্র লাগাতার বিজ্ঞাপন-সহ অনুষ্ঠানের ফলে রুচির অধঃপতন ঘটছে সর্বত্র, শহরে-শহরতলীতে, গ্রামে-গঞ্জে। বিনোদনের বাজার ধরতে গিয়ে সংস্কৃতির জগতে এক জটিল ত্রিশঙ্কু অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। পরিশীলিত নাগরিক রুচির সফিস্টেকেশনে সে পৌঁছায়নি। কারণ সেটার বাজার সীমিত। আবার ঐতিহ্যবাহী গ্রামীণ সংস্কৃতির ট্র্যাডিশন থেকেও বেরিয়ে এসেছে আধুনিকতার মোহে। তৈরি হয়েছে এক অর্ধশিক্ষিত আধাশহুরে **(Sub-urban)** পরিস্থিতি যাতে নাগরিক বোধ অধঃপতিত এবং গ্রামীণ চেতনা অন্তর্হিত। ফলত টুনির মা, বোকা ভোলা, প্যারেলাল, কলকাতার রসগোল্লা। নগরায়ন **(Urbanisation)** এর পরিবর্তে ইতরায়ন **(Vulgarisation)** ঘটে গেছে, এটা কখনই কাম্য নয়। সুযোগের অভাবে গ্রামের নগর মুখীনতা **(haphazard)**, দিশাহীন শিল্পায়ন **(Industrialization)** সহ আরো বহু রাজনৈতিক কারণ এই অধঃপতনের পিছনে কাজ করেছে, যার কুপ্রভাব পড়েছে জীবনের সর্বক্ষেত্রে, গানেও। এই প্রেতের মোকাবিলা করতে হলে নতুন যুগের শিল্পীকে অনেক বেশি সমাজ সচেতন হতে হবে। কেবল কণ্ঠকর্মী হয়ে এই জনসংখ্যাকেই বাজার ভেবে তোষামোদ করে গেলে নিজের লাভ হয়তো হবে, কিন্তু আখেরে সংস্কৃতির ক্ষতি হবে অপূরণীয়। শিল্পীর দায়িত্ব আরো বেশি, 'এই মূঢ় ম্লান মূক মুখে দিতে হবে ভাষা।'

অনেক অপ্রিয় সত্য বলে ফেললাম। তবে না বলেও উপায় ছিল না, কারণ এই সত্য জীবন থেকে নেওয়া। স্থাপত্যবিদ হিসেবে আমি এই রাজ্যের এবং আমার দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলো ঘুরে ঘুরে তাকে চিনবার সুযোগ পেয়েছি। মানুষের জন্য ঘর বাঁধার পাশাপাশি মানুষের জন্য গান বেঁধে গেছি। আর চেষ্টা করেছি মানুষের দুঃখ সুখের শরিক হতে, যা শিল্প বোধের প্রথম শর্ত 'জীবনে জীবন যোগ করা, না হলে কৃত্রিম পণ্যে ব্যর্থ হয় গানে পশরা।'

তবে আমি আশাবাদী। সুদিনের অপেক্ষায় চির আগ্রহী। যে কোনো নবীন প্রয়াস হোক না বাংলা ব্যান্ড, তার সাফল্যে দারুণ খুশি হই। আমাদের হারানো দিনগুলোর কথা মনে পড়ে যায়। মনে পড়ে পুরনো সেইসব উৎসাহী বন্ধুদের মুখ, যাদের হাত ধরে বাংলা ব্যান্ড প্রথম মঞ্চে এসেছিল, গৌতম (মণি), তাপস (বাপি), তপেশ (ভানু), আব্রাহাম, রঞ্জন, প্রদীপ (বুলা) এবং বিশু— এককথায় মহীনের ঘোড়াগুলি। যোগেশ মাইম আকাদেমিতে যাদের প্রথম আবির্ভাবের অনুষ্ঠানে আমি ছিলাম সাক্ষী ও শরিক, আমন্ত্রিত একক শিল্পী হিসেবে ওদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে গান গেয়েছিলাম, সঙ্গে গৌতমের হার্মনি— কখনও ভুলবার নয়। ওইরকম সাড়া ফেলে অনুষ্ঠানের পর আমাদের ভাগ্যে কী জুটেছিল; তা এখন ইতিহাস।

এর পাশাপাশি বা পরে (সময়ের ক্যালেন্ডারের পাতাগুলো উড়ে গেছে) কল্লোল দাশগুপ্ত, প্রবুদ্ধ ব্যানার্জী, ইন্দ্রনীল সেন, ইন্দ্রজিৎ সেন, গৌতম নাগ, শমী ব্যানার্জী, উজ্জ্বল কর, হর্ষ দাশগুপ্ত, মিহির মিত্র, সৌম্য বসু, দেবজ্যোতি মিশ্র, অমিত দত্ত, মনোজিৎ দত্ত এবং আরো অনেকের কথাই মনে পড়ে যারা আমাদের সমপথের পথিক হয়েছিলেন। এদের মধ্যে অনেকেই পরে নাম করেছেন। এখন তো সংগীত মেলা বা যে কোনো উৎসবে বাংলা ব্যান্ডের জন্য একটা মঞ্চ নির্দিষ্ট থাকে, তাতে ভিড় করে আসেন প্রচুর উৎসাহী মুখ, যাদের বেশির ভাগই তরুণ-তরুণী, সঙ্গে অনেক সময় তাদের বাবা-মা, কাকা-কাকীমারাও থাকেন যাঁরা আমাদের সময় যুবক-যুবতি ছিলেন। তারা যেন আবার ফিরে পেতে চান আমাদের সেই সময়টাকে, সেই সত্তরের দশকের ঝোড়ো দিনগুলো। আমিও অনেক সময় সেখানে গিয়ে ওদের গানগুলি শুনি। নতুন পুরোনোয় সেতুবন্ধনে কত গান উঠে আসে। ভূমি, চন্দ্রবিন্দু, ক্যাকটাস, ফসিল্‌স, কালপুরুষ, কায়া, ক্রসউইন্ডস, লক্ষ্মীছাড়া, ডিঞ্জ, শহর, দোহার, পরশপাথর আরো কত বাংলা ব্যান্ড (বিস্মৃতিজনিত অনুল্লেখ মার্জনীয়)। ওদের কণ্ঠে গৌতমের 'দরিয়ায় আইল তুফান' বা আমার 'ঘরে ফেরার সুর', (পথের প্রান্তে ওই সুদূর গাঁয়) শুনলে একসাথে আনন্দ আর বিষাদে বুকের কাছে মোচড় দিয়ে যায়। দরিয়ায় আবার কখনও তুফান আসবে কি, ঘরছাড়া নাবিকেরা কি ফিরতে পারবে তাদের ঘরে?